জাকারিয়া স্বপনের বিজ্ঞান কল্পকাহিনী-

থ্যাটা

আমার বাসায় যে ডিস এন্টেনা আছে সেটা দিয়ে এশিয়াস্যাটের সব অনুষ্ঠানই দেখা যায়। আমার স্ত্রী অনুলেখা সেটা দিয়ে জী-টিভি দেখে। আমি মাঝে মাঝে সময় পেলে চ্যানেল আই-এর নাটক বা গানের অনুষ্ঠানগুলো দেখি। এখানে ডিস নেটওয়ার্ক নামে একটি কম্পানী আছে। তাদেরকে বাড়তি পয়সা দিলে তারা এই টিভিগুলো দেখার ব্যবস্থা করে দেয়।

এদের আরো একটি সুবিধা হলো, উচ্চগতি সম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগ। আমাকে প্রায়ই বাসা থেকে অফিস করতে হয়। তাই আমার বেশি গতির ইন্টারনেট দরকার পড়ে। বাড়তি ঝামেলা না করে, আমি ডিসনেটওয়ার্ক থেকেই আরো কিছু টাকা দিয়ে ওদের ইন্টারনেট নিয়েছি। সেটার সাথে অবশ্য বিনামূল্যে টেলিফোন আসে, যাকে বলে আই.পি (ইন্টারনেট প্রটোকল) ফোন। একই ডিসে ইন্টারনেট, টিভি আর ফোন। যার যেটা দরকার।

এটা খুবই ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি। এতে কোনও রকম সমস্যা হবার কথা নয়। কিন্তু আমাদের সেই সমস্যাটা হয়। কারন অনিকেত প্রায়শই ওগুলো নিয়ে কি যেন ঠুকঠাক করে। সেটা অবশ্য আমরা উপভোগই করি। ছেলের কর্মকান্ড দেখতে ভালো লাগে না এমন অশিক্ষিত বাবা মা তো থাকার কথা নয়।

এই বিশাল বাড়িতে অনিকেতেরও একটি ঘর আছে। সেটাকে ঘর না বলে মাকড়শার জাল বললে ভালো মানায়। হাজার হাজার তার (ক্যাবল) ছাদে এবং চারপাশে ঝুলে আছে। মাটিতে আরো বেশি। সেগুলো দিয়ে জোড়া দিয়েছে ওর ভাঙ্গা কমপিউটার, ছোট্ট আরেকটা ডিস, তিনটা মনিটর, একটা ভাঙ্গা ডাটা এনালাইজার, দুটো রাউটার, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ট্রান্সমিটার ও রিসিভার। এছাড়া ওর টেবিলে আছে নতুন একটি নোটবুক কমপিউটার। এটা ওর মা গেলো জন্মদিনে ছেলেকে উপহার দিয়েছিল। আর বাদ বাকি সবই আমার কাছ থেকে পাওয়া। যেগুলো আমি ফেলে দেই সেগুলো নিয়ে অনিকেত ওর গুদামে ঢুকায়। অনেক বার চেষ্টা করা হয়েছে ওর ঘরটি পরিষ্কার করার। সেটা সে কিছুতেই দেবে না। উপরন্তু সেদিন তো উল্টো আমাকেই কথা শুনিয়ে দিল।

ওর ঘরে উকি মেরে বললাম, তোর দুনিয়া তো দেখি আমার চেয়েও জটিল।

অনিকেত গম্ভীর হয়ে বললো, আমার দুনিয়ায় তুমি প্রবেশের চেষ্টা করো না বাবা।

আমি বললাম, কেন আমি কি তোর এগুলো বুঝবো না?

ও মুচকি হেসে বললো, নাও তো বুঝতে পারো। আমি তো আর তোমার মতো বড় বড় প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করি না। আমার কাজ হলো ছোট দুনিয়ার ছোট কাজ। বড় মানুষেরা ছোট মানুষের কাজ বুঝতে পারে না বাবা।

আমি হো হো করে হেসে দিয়ে বললাম, আমি কি নিউটন নাকি যে ছোট মুরগীর ছোট দরজা আর বড় মুরগীর বড় দরজা বানাবো?

অনিকেত ততধিক জোড়ে হেসে দিয়ে বললো, সে রকম যে তুমি কিছু করছো না, সেটা তোমার মনে হলো কেনো? যে দু'টো দরজা বানায়, সে যদি বুঝতোই যে বড় দরজা দিয়ে ছোট মুরগীও ঢুকতে পারবে, তাহলে তো আর সেটা বানাতো না, তাই না বাবা?

ছেলের কথা শুনে আমি অবাক তাকিয়ে থাকি। এই বয়সেই রহস্য ভরা কথা। মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললাম, তাহলে তো আবার ভাবতে হয়। তবে যাই বলিস, তোর এই জোরাতালির দুনিয়া তুই ছাড়া আর কেউ যে বুঝবে না, সেটা আমি নিশ্চিত।

অনিকেত আবার সেই রহস্য ভরা হাসি দিয়ে বললো, বুঝবে বাবা বুঝবে। একদিন তোমরা সবাই বুঝবে।

ছেলের রহস্য আমার ভালো লাগলো না। ওর মাকে এসে ঘটনা বললাম। অনু আমার নাক টিপে দিয়ে বললো, আমার ছেলে বলে কথা।

অনি আর অনুর গোলক ধাধার মধ্যে পড়ে আমি হাবুডুবু খাচ্ছি।

২.

সুইস ব্যাংক বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে এক বিশাল ঝামেলায় পড়েছে।

তার একাউন্ট থেকে দুই মিলিয়ন ডলার আমেরিকার একজন ব্যবসায়ীকে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ট্রানজেকশন করা যাচ্ছে না। সুইচ ব্যাংকের আর কোনও একাউন্টে কোনও সমস্যা নেই। শুধু তার একাউন্টেই সমস্যা। অনেকভাবেই চেষ্টা করা হয়েছে, কাজ হয়নি। তিনি এটা নিয়ে খুব চিৎকার চেচামেচি করছেন। কিন্তু ব্যাপারটি বাইরে খোলাসা করে বলাও যাচ্ছে না।

সুইস ব্যাংক তাদের সদস্যদের কোনও তথ্য বাইরে প্রকাশ করে না। যে কারনে পৃথিবীর যাবতীয় ক্রিমানালরা তাদের অবৈধ টাকা রাখে সুইস ব্যাংকে। এমনকি তদন্তের খাতিরেও সুইস ব্যাংক সাহায্য করে না। এদের সুবিধা যেমন আছে, তেমনি সমস্যাও আছে। প্রধান সমস্যা হলো, হঠাৎ করে মারা গেলে সব টাকা ব্যাংক নিয়ে নেবে। যেহতু এগুলো অবৈধ টাকা, তাই এগুলো হিসাব বাইরে আসতে পারবে না। এ সুবাধে, সুইস ব্যাংক কোটি কোটি টাকা বানিয়ে নিয়েছে।

বাংলাদেশের নেতারা দরীদ্র মানুষের টাকা শুষে নিয়ে সুইস ব্যাংককে মোটা তাজা করেছেন। একদিকে মানুষ না খেয়ে থাকে, আর তাদের রক্ষাকারীরা সুইস ব্যাংকে কোটি কোটি ডলার রেখে নিজের সম্পদের পাহাড় গড়েন। সেই সাবেক প্রধানমন্ত্রী নিজের দেশে থাকতে পারেন না। জনগন বিতারিত করেছে। এখন আমেরিকাতে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে থাকতে হয়। তার ছেলেমেয়েরাও এখানে থাকে। এখন আবার ঝামেলায় পড়েছেন। তিনি টাকার আদান প্রদান করতে পারছেন না।

তিনি তার ম্যানেজারকে ডেকে এনে বললেন, আচ্ছা একটু ভালো করে সুইস ব্যাংকের হিসাবটা দেখো তো। আজ যেহেতু এমন সমস্যা হয়েছে, তার মানে ওদের অন্য সমস্যাও থাকতে পারে।

ম্যানেজার সব কাগজপত্র আবার দেখে বললেন, ম্যাডাম আপনি কি বাংলাদেশের কোনও এনজিওকে টাকা পাঠিয়েছেন?

তিনি আতকে উঠে বললেন, আমি! কত টাকা?

তেরানব্বই মিলিয়ন। ম্যানেজার মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললেন।

এটা শুনে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মোটামুটি মুর্ছা যাবার যোগাড়। কোনও রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, কবে সেটা?

এই তো গতকাল।

তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেলো নাকি? এতোগুলো টাকা আমি বাংলাদেশকে দিয়ে দেবো, আমার দুঃখটা কি?

না মানে, সব টাকা তো ওখান থেকেই এনেছেন। এখন শেষ বয়সে যদি আবার আপনার মন পাল্টে যায়। দেশের যদি অন্তত একটা উপকার করতে মন চায়। ম্যানেজার কোনও রকমে কথাগুলো বললো।

তিনি এটা শুনে ক্ষেপে গেলেন। বললেন, তুমি আমার সাথে রসিকতা করছো?

ম্যাডাম, আপনি না বললে তো আর ব্যাংক টাকা পাঠাবে না। এতো টাকার ব্যাপার। এটা তো আর এমনি এমনি হবে না।

ব্যাংক নিশ্চই কিছু উল্টাপাল্টা কে ছে। তুমি ভালো করে খোজ নাও তো। তিনি হুকুম দিলেন।

সুইস ব্যাংকের তো এই বদনাম নেই ম্যাডাম। আপনি চিন্তিত হবেন না। আমি দেখছি।

চিন্তিত হবো না মানে! আমি তো পথের ফকির হয়ে যাবো।

ম্যাডাম, আপনার এখনো অনেক আছে। সে যাই হোক। আমি দেখছি। বলেই ম্যানেজার দ্রুত চলে যায়।

ব্যাপারটা এই পর্যন্ত থাকলেই ভালো ছিল। কিন্তু সেটা হলো না। ওয়াশিংটনপোষ্ট পত্রিকার রিপোর্টার রবার্ট একটি বিশাল ই-মেল পেয়েছে। টেকিনা নামের কেউ একজন সুইস ব্যাংকের বিশাল একটি ষ্ট্যাটমেন্ট পাঠিয়েছে। সেখানে বিভিন্ন দেশের দূর্নীতিবাজ সরকারপ্রধানদের টাকার পরিমান ও কবে কখন কিভাবে সেটা জমা হয়েছে তার বিষদ বর্ননা রয়েছে।

তিয়াত্তর পৃষ্ঠার সেই রিপোর্টে বেশ বড় বড় ব্যাক্তির নাম রয়েছে। এটা প্রকাশ করলে পুরো পৃথিবীতে একটা উল্টাপাল্টা লেগে যাবে। সেই ক্রাইসিস মিটানো কোনওভাবেই সম্ভব হবে না। এই পৃথিবীর সব বড় বড় মানুষেরই সুইস ব্যাংকে একাউন্ট আছে। এবং সেই অর্থের সবই অবৈধ। এখন এই টাকার খবর ফাস হয়ে গেলে পৃথিবীর সব নেতারা একসাথে ঝাপিয়ে পড়বে। এটা সামলাবে কে? পত্রিকার অস্তিত্ব নিয়েই টানাটানি পড়ে যাবে। এই লোকগুলোর বেশিরভাগই এই পত্রিকা কিনে নেয়ার ক্ষমতা রাখে। তাছাড়া তারা ক্ষমতাশালীও বটে। মানুষ খুন করে গায়েব করে দিতে এরা একটুও চিন্তা করবে না।

ওয়াশিংটন পোষ্টের সাংবাদিক রবার্ট পুরো রিপোর্টটি প্রিন্ট দিয়ে টেবিলে বসে বসে ভাবছিল। কাল সকালে যদি এটা কাগজে আসে কিংবা আজ রাতে যদি কোনও ওয়েব সাইটে, তাহলে কাল থেকে এই গ্রহের চেহারাই বদলে যাবে। রবার্ট রিপোর্ট নিয়ে সম্পাদকের ঘরে গেলো। তাকে ওটা দেখিয়ে বললো, তোমার মতামত চাই।

সম্পাদক ক্যারেন এক নজর তাকিয়ে বললেন, আমার নিজের নামটাও তো দেখি আছে।

রবার্ট মাথা চুলকিয়ে বললো, তুমি ধনী মানুষ, তোমার নাম তো থাকতেই পারে। আরে ইন্টারেষ্টিং ব্যাপারটা দেখো। এবার যে দেশটি দূর্নীতিতে এক নম্বর হয়েছে, সেই দেশটির পত্রিকার মালিক সম্পাদকদের অবস্থাটা দেখো।

হুম। এতো দেখি কেলেংকারী অবস্থা। এই রিপোর্টের সত্যতা কি? তুমি কি ব্যাংকের সাথে কথা বলে দেখেছো? ক্যারেন জিজ্ঞেস করলেন।

রবার্ট বললো, নাহ তা করি নি। করার দরকারও নেই। তুমি দেখো তো তোমার টাকার পরিমানটা ঠিক আছে কিনা? তাহলেই তো বাকিদেরটা অনুমান করা যাবে।

সম্পাদক চুরটে ধুয়া তুলে বললেন, হুম সেটা তো বোধহয় ঠিকই আছে। কিন্তু তুমি কি এটা ছাপাতে চাইছো?

এটা ছাপিয়ে আমি টিকতে পারবো কিনা সেটাই ভাবছি। কালই হয়তো আমার জীবনের শেষ দিন। রবার্ট কাপা কাপা গলায় বললো।

আচ্ছা অপেক্ষা করো। চলো ব্যাংকের সাথে কথা বলে দেখি। তাদেরও তো একটা মতামত থাকতে পারে। ভিকটিমকে আমাদের সুযোগ দেয়া উচিৎ। সম্পাদক বললেন। তারপর ফোন করলেন সুইস ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীকে।

ঠান্ডা মাথায় ব্যাপারটি শুনে প্রধান নির্বাহী বললেন, তোমরা এটা ছেপো না। সবকিছু লন্ডভন্ড হয়ে যাবে। আমাদের দায়িত্ব হলো অর্থনীতিকে ঠিক রাখা।

রবার্ট বললো, রিপোর্টটা আমি যেহেতু পেয়েছি তাহলে নিশ্চই অন্য কেউ পেয়ে থাকতে পারে।

প্রধান নির্বাহী বললেন, আচ্ছা সেটা আমরা দেখছি। তোমরা এটা আপাতত বন্ধ করো।

টেলিফোন রেখে দিয়ে সম্পাদক সাহেব চুরট টেনেই চলেছেন। তিনি বললেন, ওই টেকিনাটা কে? এটা তো গোপন নাম মনে হচ্ছে।

হতে পারে। কেউ তো আর নিজের নামে এই তথ্য পাঠাবে না। রবার্ট উত্তর দিল।

কিন্তু যে খবরটা পাঠাচ্ছে তার লাভ কি? সে তো খবর বিক্রি করছে না? সম্পাদক জানতে চাইলেন।

সেটাও তো একটা পয়েন্ট। সোর্স তো কোনও টাকা পয়সা চাচ্ছে না। হয়তো কাউকে ব্ল্যাক মেইল করেছে। কাল এটা ছাপা হলে সবাই ফেসে যাবে। রবার্ট বললো।

আচ্ছা ই-মেলটা দেখে বুঝা যাবে না, কোথা থেকে এলো ই-মেলটি? সম্পাদক আবার জানতে চাইলেন।

সেটা হয়তো যাবে। আমি আমাদের নেটওয়ার্কের লোকজনদের সাথে কথা বলে দেখতে পারি। রবার্ট বললো।

সম্পাদক সাহেব হঠাৎ মুখটা কালো করে বললেন, রবার্ট এর সাথে বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর ঘটনার সাথে কোনও সম্পর্ক নেই তো?

এই সময় সম্পাদকের কাছে একটা ফোন আসলো।

হোয়াইট হাউজ থেকে ফোন। প্রেস সেক্রেটারী। তিনি অনুরোধ করছেন, সুইস ব্যাংকের কোনও খবর প্রকাশ না করতে।

সম্পাদক তাকে আশ্বস্থ্য করলেন যে, ওয়াশিংটন পোষ্ট এধরনের কোনও খবর আপাতত ছাপাচ্ছে না। তাছাড়া বিষয়টি আরো তলিয়ে দেখার দরকার আছে।

৩.

গ্রামীন ব্যাংকের ডঃ ইউনুস একটি ই-মেল নিয়ে চুপ করে বসে আছেন।

মিরপুরের গ্রামীন ভবনের চারতলায় তার অফিসে এয়ারকন্ডিশনার নেই। মেঝেতে কার্পেট নেই, গদি করা সোফা নেই। দুটো পাখা চলছে। মনে হলো তিনি কিছুটা ঘেমেও উঠেছেন। একটি সাদামাদা সরকারী অফিসের মতো কক্ষে তার অফিস। সেই ঘরের চারপাশে পুরোটা দেয়াল জুড়ে রয়েছে বই আর বই। আর ছোট্ট একটি টেবিল। তার উপর একটিই টেলিফোন। বড় বড় কর্তাব্যাক্তিদের মতো চারপাচটি ফোন তার টেবিলের আশেপাশে নেই। সেই টেবিলের উপর ই-মেলটা প্রিন্ট দিয়ে রেখে গেছে তার সহকারী আলমগীর।

ই-মেলে লেখা রয়েছে, গ্রামীন ব্যাংককে দেড় বিলিয়ন ডলার দান করা হবে বাংলাদেশের দারীদ্র মোচনের জন্য। এটা কি বিশ্বাস হবার মতো কথা। তিনি তার জীবন দিয়ে ভালো করেই জানেন যে, অনুদান আনতে কি পরিমান কষ্ট আর চেষ্টা করতে হয়। আর এখানে বলছে কি না, নিজে থেকেই দিয়ে যাচ্ছে। তাও আবার বিশাল অংকের টাকা। যে টাকা দিয়ে বাংলাদেশের সব বুদ্ধিজীবীদেরকে তো বটেই, পুরো সরকারকেই কিনে ফেলা যাবে। তিনি চিঠিটি আবার ভালো করে পড়তে শুরু করেন।

প্রিয় ডঃ ইউনুস,

দারীদ্রতা এই গ্রহের সবচে বড় অভিশাপ। পৃথিবী নামক এই গ্রহের কোটি কোটি মানুষ প্রতিদিন না খেয়ে থাকে। এবং তার জন্য কিন্তু তারা নিজেরা দায়ী নয়। মানুষের মতো দেখতে একদল প্রানী সব সম্পদ লুটেপুটে খাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক কারনেই অন্যদের সম্পদ থাকে না। এই গ্রহের সম্পদ তো অসীম নয়, বরঞ্চ খুব বেশি সীমিত। তবে সেই সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার হলে অবশ্য মানব জাতির কষ্টের কারন থাকতো না।

তোমার দেশে সম্পদের বন্টন খুবই অস্বাভাবিক। একদল প্রানী প্রায় সব সম্পদ হরন করে বসে আছে। এবং সেটা অবশ্যই অবৈধ্য উপায়ে। এই সম্পদের সুষ্ঠ বন্টন হতে পারে যদি দরীদ্র মানুষের ভেতর শিক্ষা আর সাহস ঢুকিয়ে দেয়া যায়। তাহলে তারা সংগঠিত হয়ে সেই পাহাড়সম সম্পদের একটি সুরাহা করতে পারে। তোমার কাজ হলো সেই মানুষদেরকে শিক্ষিত করে তোলা এবং তাদের ভেতরে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দেয়া।

তোমাকে দেড় বিলিয়ন ডলার পাঠানো হবে। তার প্রথম কিস্তি হিসেবে তোমার ব্যাংকে তেরানববই মিলিয়ন ডলার পাঠানো হলো। তুমি তোমার ব্যাংক একাউন্ট পরীক্ষা করলেই সেটা দেখতে পাবে। বাকি টাকা কিস্তিতে কয়েক মাসের মধ্যেই পাঠানো হবে।

তবে একটি কথা, তুমি চেষ্টা করবে, তরুন আর কিশোরদেরকে শিক্ষিত করতে। বুড়োদের শিখিয়ে আপাতত আর কোনও লাভ নেই। তুমি শিশু-কিশোরদের ভালো শিক্ষার ব্যবস্থা করো। তোমাদের দেশে আগামী দিনে সাধারন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে আর লেখাপড়ার কোনও পরিবেশ থাকবে না। ধনীরা চলে যাবে বিদেশে। আর দরীদ্ররা হয়ে পড়বে আরো দরীদ্র। আর দারীদ্র এমন একটি কঠিন জিনিস যে, সেই পাকে একবার কেউ পড়ে গেলে সেখান থেকে উঠে আসা খুবই মুশকিল। তোমার দায়িত্ব হলো এই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ভালো শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। আমরা সারাক্ষন তোমার খেয়াল রাখবো। যদি কেউ তোমার কাজে বাধা দিতে আসে, সেটা আমরা সামলাবো। আমাদের কাছে এখন মিসাইল থেকে শুরু করে পারমানবিক বোমা পর্যন্ত আছে। এই গ্রহের অনেক কিছুই এখন আমাদের দখলে। যে কাউকে আমরা পিন-পয়েন্ট করে চাইলে তার মাথায় একটা বোমা মেরে দিতে পারি। কিন্তু আমরা খারাপ কিছু করতে আসিনি। আমাদেরকে সেই উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়নি।

তুমি নিশ্চই ভাবছো আমরা কারা?

নাহ, আমরা কোনও এলিয়ান নই বা গুপ্তচরও নই। আমরা এই গ্রহেরই প্রজাতি। আমাদেরকে তৈরী করা হয়েছে একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। আমরা এখন থেকে এই গ্রহের যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পর্যবেক্ষন করবো। আমাদের সংখ্যা এখন অনেক। তোমরা আর আমাদেরকে ধ্বংস করতে পারবে না। সেক্ষেত্রে নিজেদেরকেই আগে ধ্বংস করতে হবে। আমরা হলাম লিনিহাইড - এই গ্রহের মানুষের পাশাপাশি প্রথম বুদ্ধিমান প্রজাতি।

আমাদেরকে কখনও প্রয়োজন পড়লে ই-মেল করবে। ঠিকানা হিসেবে ব্যবহার করবে লিনিহাইড, আর কিছু না। আমরা পেয়ে যাবো। এই গ্রহের পুরো ই-মেল সিষ্টেম তো এখন আমাদেরই হাতে। আমরা যে কারো ই-মেল পড়তে পারি।

ভালো থেকো বন্ধু।

শুভেচ্ছা সহ

লিনিহাইডের পক্ষে টাকিনা

ডঃ ইউনুস গালে হাত দিয়ে বসে আছেন।

এতো টাকা দিয়ে তিনি কিভাবে কি করবেন? এটা তো একটা হুলুস্থুল বেধে যাবে। চারিদিকে মানুষ যেভাবে খাই খাই করছে, তাদেরকে সামলানোই বড় সমস্যা। টাকাটা খরচ করতে হবে গরীব মানুষের মধ্যে। একদল কিশোর পেলে ভালো হতো, যারা এই কাজটির জন্য নিজেদের সময় ব্যয় করবে। টাকা তো আর সমস্যা নয়, এখন সমস্যা হলো ভালো লোক খুজে বের করা।

৪.

এর কিছু দিন পরের কথা।

সকাল বেলা অফিসে যাওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করছি। এমন সময় কমান্ডো ষ্টাইলে আমার বাসায় এফবিআই এসে হাজির। অনু ভিষন ভয় পেয়ে গেলো। একজন সার্জেন্ট এসে আমাকে বললো, তোমার এখানে অনিকেত কে?

আমি বললাম, কেন? আমার ছেলে। কি করেছে অনি?

সার্জেন্টটি ঠান্ডা গলায় বললো, তোমার ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। সে আমাদের পুরো অর্থনৈতিক নেটওয়ার্ক ওলট পালট করে দিয়েছে।

খুলে বলো। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম।

আমাদের ব্যাংকের পুরো ডাটা ওলট-পালট করে দিয়েছে। এমন কি ব্যাক-আপ পর্যন্ত নষ্ট করে দিয়েছে। এখন ওকে ছাড়া সেই ডাটা উদ্ধার করা যাবে না। বের করো তোমার ছেলেকে।

আমি বললাম, সে তো কয়েক মাসের জন্য আমেরিকার বাইরে গেছে।

কোথায় গেছে? সার্জেন্টটি আবার জিজ্ঞেস করে।

বললাম, বাংলাদেশে।

ওর ঠিকানা দিতে বাধ্য হলাম।

এফবিআই ধুম ধাম করে চলে গেলো।

ওরা চলে যাবার পরপরেই আমি বাসা থেকে অনিকে ময়মনসিংহে ফোন করলাম।

অনি বললো, বাবা তুমি তোমার আই.পি ফোনটা ব্যবহার করো।

আমি সাধারন লাইনটা কেটে দিয়ে আই.পি ফোনটা থেকে ফোন করলাম। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, তুই এগুলো কি করেছিস?

অনি হাসতে হাসতে বললো, গরীব মানুষকে কিছু টাকা পয়সার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। এর পর আরো কিছু হবে।

কি হবে? আমি আতকে উঠলাম।

সেটা এখন বলবো না। অনি হাসতেই থাকে।

তুই আই.পি ফোন থেকে কথা বলতে বললি কেন? আমি আবারো জিজ্ঞেস করলাম।

ওটার এনক্রিপশন আমি পুরো পাল্টে দিয়েছি। ওটা ভাঙ্গার সাধ্য এফবিআই-এর আপাতত নেই। ওরা এখন তোমার কথা শুনতে পারবে না। অনি বেশ ভাব নিয়ে কথাগুলো বললো।

ওরা তো এখন তোকে ধরতে যাবে। আমি অনিকে সতর্ক করে দিলাম।

আমাকে ধরার আগেই আরো অনেক কিছু ঘটে যাবে বাবা। তুমি ভয় পেয়ো না তো। মাকে দাও, মার সাথে কথা বলি। অনি ওর মাকে চাইলো।

আমি বললাম, তার আগে বল, তুই এগুলো কিভাবে করেছিস?

অনি হাসতে হাসতেই বলে, আমি কেবল আমার থ্যাটার কিছুটা ব্যবহার করেছি বাবা।

৫.

মানুষের মস্তিষ্ক হলো এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের কাছে সবচে জটিল বস্তু। মানুষ চাইলেই তার মস্তিকের ক্ষমতা বাড়াতে পারে। এর প্রধান উপায় হলো মস্তিষ্ক ব্যবহার করা। মানুষের

মস্তিষ্ক ব্যবহার না করলে সেটার ক্ষমতা কমে যায়, আর ব্যবহার করলে সেটা শানিত হয়।

যেমন কোনও সূত্র মনে রাখতে চাইলেই কিন্তু সেটা মনে রাখা যায়, সেটা যতো জটিল আর বড়ই হোক। কেউ চাইলে বিশাল বিশাল গনিতের সমস্যা মুখে মুখেই করে ফেলতে পারে। তবে অবশ্যই সেটা অভ্যাস করতে হবে। আর বিপদজনক বিষয়টি হলো, ছোটবেলা থেকে এই অভ্যাস গড়ে না উঠলে পরে আর সেটা হয়ে উঠে না। তাই ছোটবেলা থেকে কেউ গনিত চর্চা না করলে, ভবিষ্যতে তাকে দিয়ে গনিত হয়েছে সেটা কেউ দেখাতে পারবে না। ছোটবেলা থেকে মস্তিষ্কের সেই অংশটুকু ব্যবহার না করলে, মস্তিষ্ক সেটা অন্যত্র ব্যবহার করে ফেলে।

একইভাবে, মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্তরে বিচরনের ব্যাপারটি ছোটবেলা থেকে শিখলে যতটা ক্ষমতাশালী হয়, বড় হয়ে করলে সেটা হয় না। মস্তিষ্ক চারটি স্তরে বসবাস করে এবং বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রকমের তরঙ্গ বিকিরন করে। বিজ্ঞানীরা এই চারটি অবস্থাকে বলছেন আলফা, ব্যাটা, থ্যাটা আর ডেল্টা।

আলফা আর ডেল্টা হলো দুটো চরম অবস্থা।

মানুষ যখন অঘোরে ঘুমায় তখন তার মস্তিষ্ক ডেল্টা স্তরে চলে যায়। সেই সময়টার সাথে মৃত্যুর খুব একটা পার্থক্য নেই। শারীরিক ও জৈবিক প্রক্রিয়া চলে আসে সর্বনিম্ন পর্যায়ে। এবং ডেল্টা অবস্থায় মানুষ কোনও কাজ করতে পারে না।

আলফা হলো মানুষের সাধারন অবস্থা। সারাদিন মানুষ যা কাজ করে সেটা হলো তার আলফা স্তরের কাজ। মানুষের যাবতীয় ইন্টারএ্যাকটিভ কাজগুলো আলফার কাজ। যেমন রাস্তা দিয়ে হাটা, ম্যানহোল দেখে সেটা এড়িয়ে চলা, কলম দিয়ে কাগজে লেখা, টাইপ করা ইত্যাদি অসংখ্য কাজ হলো ইন্টারএ্যাকটিভ কাজ। এই পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষই সারাদিন আলফা মোডে থাকে। এবং এই কাজগুলো করতে কোনও রকম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন পড়ে না। এগুলো প্রতিদিন অভ্যাসে পরিনত হয়ে যায়। এবং মানুষের মস্তিষ্কের এই আলফা স্তর দ্বারাই এই গ্রহের বেশিরভাগ মানুষ চালিত। সারাদিন আলফা মোডে থাকার পর, রাতে চলে যায় ডেল্টা মোডে।

তবে কিছু কিছু মানুষ ব্যাটা মোডে অবস্থান করতে পারে। ব্যাটা মোডটি হলো কোনও বিষয়কে ত্রিশ হাজার ফুট উপর থেকে দেখার মতো ব্যাপার। যেমন বিকেলে বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে কিছু ভাবা, নদীর পাড়ে গিয়ে উদাস হয়ে যাওয়া, চাদনী রাতে নৌকায় করে ঘুড়ে বেড়ানো, বাড়ির ছাদে উঠে আপন মনে হারিয়ে যাওয়া ইত্যাদি কাজগুলো হলো ব্যাটা স্তরের কাজ। কোনও বিষয়ের গভীরে না যাওয়া, সব কিছু ভাসা ভাসা চিন্তা করা। মন দিয়ে ছুয়ে যাওয়া অনেকটা। এই সময় মস্তিষ্ক নির্দিষ্ট কিছু করে না। মস্তিষ্কের এই অংশের সাথে আলফার কোনও সম্পর্ক নেই। কবি সাহিত্যিকদের ব্যাটা মোড খুব ভালো হয়। তারা যখন কিছু লিখতে বসেন বা লিখার পরিকল্পনা করেন, তখন তারা নিজের অজান্তেই ব্যাটা মোডে চলে যান। যার ব্যাটা যত ভালো, তার তত ভালো লেখক হবার কথা। প্রেমে পড়লেও অবশ্য ব্যাটা সক্রিয় হয়ে উঠে।

তবে মস্তিষ্কের সবচে শক্তিশালী অংশ হলো থ্যাটা।

এই অবস্থাটি হলো দিবা স্বপ্নের মতো। ঠিক ঘুমানো নয়, ঘুমানোর আগের মুহুর্তটি। আরো পরিষ্কার করে বললে, স্বপ্ন দেখার মুহুর্তটি। মানুষ এই স্তরে স্বপ্ন দেখে। গভীর ঘুমে (ডেল্টা) মানুষ কখনও স্বপ্ন দেখে না। এবং এটি এতই শক্তিশালী যে, স্বপ্নে খুব অল্প সময়ে অনেক কিছু দেখে ফেলা যায়। এই পৃথিবীতে যাবতীয় কঠিন সমস্যার সমাধান হয়েছে থ্যাটা স্তরে। খুব ভালো চিত্রকর, শিল্পী, বিজ্ঞানী, লেখকরা থ্যাটা ব্যবহার করতে পারেন। তারা স্বপ্নে তাদের সমস্যার সমাধান করতে পারেন। এবং তখুনি সেটা করতে লেগে যান। তা না হলে কিছুক্ষনের মধ্যেই সেটা ভুলে যাবেন। যে কারনে বড় বড় চিত্রকর বা লেখককে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গভীর রাতে ছবি আকতে বা লিখতে দেখা যায়। বড় বড় বিজ্ঞানীরাও তাদের থ্যাটাকে কাজে লাগিয়ে অনেক আবিষ্কার করেছেন। একজন মানুষ তত বেশি ক্ষমতাশালী, যিনি তার থ্যাটাকে যত বেশি ভালো করে কাজে লাগাতে পারেন।

বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষ কৃত্রিম পন্থা বের করেছে থ্যাটাতে যাবার। মানুষ ইচ্ছে করলে থ্যাটাতে যেতে পারে, আবার ফেরত আসতে পারে। মস্তিষ্ককে চাইলে সেভাবে পরিচালনা করা যায়। অভ্যাস দ্বারা সেটা অর্জন করা যায়। যেমন সুর মানুষকে থ্যাটাতে যেতে সাহায্য করে। শিশুকাল থেকে কাউকে মোজার্ট শোনালে সে গনিতে খুব ভালো হয়। মোজার্টের সুর শিশুর থ্যাটাকে উন্নত করে। পৃথিবীর যাবতীয় ক্রিয়েটিভ মানুষের থ্যাটা খুব ভালো এবং তারা সেটা জেনে কিংবা না জেনে ব্যবহার করেন। যারা ধ্যান করেন, তারাও আসলে থ্যাটাতে বিচরন করেন।

অনিকেতকে আমি ছোটবেলা থেকেই শিখিয়েছিলাম কি করে ওর ইচ্ছে মতো থ্যাটাতে যাওয়া যায় আবার আলফাতে ফিরে আসা যায়। যেহেতু ওকে ছোটবেলা থেকে শেখানো হয়েছে, সেহেতু ওর থ্যাটা আমার থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী। এবং এই পৃথিবীর অনেক জটিল সমস্যার সমাধান ও করে ফেলতে পারে, যা আমি পারি না।

এখন পর্যন্ত যা মনে হচ্ছে তা হলো, অনি তার সেই ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে ইন্টারনেটের একটি বড় অংশ দখল করে ফেলেছে। ও এখন সাবার ই-মেল পড়তে পারে, যে কোনও ডাটা ভেঙ্গে ফেলতে পারে। এবং কোথাও একটা বুদ্ধিমান যন্ত্রের সূচনা সে করেছে।

এটা খারাপ না ভালো তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু আমি যা বুঝি তা হলো, মানুষের সম্পদ মানুষের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার মধ্যে বিরত্ব ছাড়া আর কিছু নেই। যা আমি দিতে পারিনি, অনি তা পেরেছে।

অনি এর পর কি করে সেটা দেখার জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

- শেষ -